sw_sept2002,banglainternet.com

হ্যানিম্যান

হ্যানিম্যানের সম্পূর্ণ নাম স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির জনক রূপেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি আজও দেশে দেশে প্রচলিত।

জার্মানির অন্তর্গত সাক্সলি প্রদেশে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল এক হতদরিদ্র পরিবারে ডা. হ্যানিম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তার ছেলেবেলা কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। বাবা খ্রিস্টান, গটফ্রেড হ্যানিম্যান ছিলেন এক গরিব শিল্পী। 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' -- সংসারের এমনই অবস্থা। ডা. হ্যানিম্যান ছিলেন পিতার তৃতীয় সন্তান। সুখ বা স্বচ্ছলতা তার কাছে ছিলো স্বপ্নের মতো। বেশিরভাগ দিনই হ্যানিম্যান পরিবারের সকলকে খিদে মেটাতে হতো একটা মাত্র রুটিকে সম্বল করে। অর্থের অভাবে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি তিনি। স্কুলে যাবার একমাত্র পোশাকটি ময়লা হলেও সাবান কেনার সামর্থ্য হতো না। আলু দিয়ে পরিষ্কার করে নিতেন নিজের পোশাক।

কিন্তু কঠোর দারিদ্র্য তার প্রতিভাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক ইচ্ছার বলে তিনি প্রখর রৌদ্রের মতো উদ্ভাসিত হয়েছেন। জীবিতকালেই স্যামুয়েল হ্যানিম্যান একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কোনোক্রমে লিপজিগ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করেছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যায়নের ইচ্ছা নিয়ে চলে এলেন ভিয়েনা। বাবার পাঠানো সামান্য অর্থই ছিলো ভরসা। কিন্তু তা ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য। ফলে বাধ্য হয়েই এক সময় পড়াশুনা বন্ধ করে চাকরির সন্ধানে নেমে পড়েন। দিনের পর দিন উদভ্রান্তের মতো ঘুরলেন পথে পথে। দৈবক্রমেই এ সময় একদিন তার সঙ্গে পরিচয় হলো ট্রানসিলভানিয়ার গভর্নরের সাথে। আলাপ করে গভর্নর ভদ্রলোক হ্যানিম্যানের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তাকে পরিবারের গৃহচিকিৎসক রূপে নিয়োগ করলেন।

ভাগ্যের চাকা এত দিনে ঘুরতে শুরু করলো উল্টো মুখে। ট্রানসিলভানিয়ার সেই গভর্নরের বাড়িতে ছিলো একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। বহু মূল্যবান পুস্তক সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিলো। গভর্নর নিজেও ছিলেন শিক্ষানুরাগী। হ্যানিম্যানের আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি তাকে গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করার অনুমতি দিলেন। কেবল তাই নয় গ্রন্থাগারটি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্বই তাকে অর্পণ করলেন।

বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ছিলো প্রবল, কিন্তু কখনো সুযোগ পাননি তেমন। হ্যানিম্যান এবার মনের আনন্দে বইয়ের জগতে ডুব দিলেন। মেধা ছিলো অসাধারণ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চিন্তাশীল লেখকদের লেখা পড়বার আগ্রহে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হ্যানিম্যান পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষা শিখে ফেললেন। তারপর চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ের ওপরে লেখা যত বই পেলেন পড়তে শুরু করলেন। কিছুকাল পরেই মেতে উঠলেন আনুষঙ্গিক অপর একটি বিষয় নিয়ে, তা হলো চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা।

এবারে পথ খুঁজে পেলেন হ্যানিম্যান। স্থির করলেন তিনি নতুন ধরনের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন। একদিন সুযোগ বুঝে মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন গভর্নর সাহেবকে। বিদ্যানুরাগী সাহেবটি তাতে খুশি হলেন এবং হ্যানিম্যানকে উৎসাহিত করলেন। নিজের উদ্যোগে তার প্রতিভার বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও করে দিলেন।

চিকিৎসা ব্যবসা এবং গবেষণা, এবারে দুটি কাজ একই সাথে করে চললেন হ্যানিম্যান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার গবেষণার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে। তার গবেষণাবলীকে স্বাগত জানালো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৭৭৯ খ্রি: এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এমডি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলো। ১৭৮২ খ্রি: বিয়ে করলেন হ্যানিম্যান। সেই বছরই ট্রানসিলভানিয়া ছেড়ে আরো উন্নত গবেষণার জন্য চলে এলেন ড্রেসডেন শহরে। এখানে এসে পুরোপুরিভাবে গবেষণাতেই আত্মনিয়োগ করলেন।

গোড়ার দিকে হ্যানিম্যানের গবেষণার বিষয় ছিলো কতগুলো ভেষজ এবং আর্সেনিক বা সেঁকোবিষ। তিনি তার গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। বিষয়ের অভিনবত্ব এবং গবেষণার ফলাফল দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করলো। ফলে হ্যানিম্যানের খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেলো। দীর্ঘ গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন তিনি। ঘর সংসারের কথা ভুলে গিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর সংগ্রহ করেন নানা জাতের ভেষজ। সেগুলো নিয়ে প্রয়োগ আর পরীক্ষা-

স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান
(জন্ম : ১৭৫৫, মৃত্যু : ১৮৪৩)

নিরীক্ষা চলে। আহার নিদ্রার কথাও ভুলে গেলেন। অর্থের অভাবে সংসারে অনটন দেখা দিলো। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। প্রয়োজনীয় ভেষজের সন্ধানে তাকে দেশ ছেড়ে বিদেশেও ছুটতে হতো। যে কোনো ভেষজ প্রয়োগের আগে নিজে খেয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করে নিতেন। এভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে বহুবার সঙ্কটাপন্নও হতে হয়েছে তাকে।

একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে সিঙ্কোনা গাছের ছাল খেলেন। সেই সময় চিকিৎসকরা সিঙ্কোনার ছাল ম্যালেরিয়া রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। সুস্থ দেহে সেই ছাল খাওয়ার ফলে ম্যালেরিয়ার মতো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো তার। বিস্মিত হলেন হ্যানিম্যান। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার জন্য কয়েকজন বন্ধুর ওপরেও প্রয়োগ করলেন সিঙ্কোনার ছাল। দেখা গেল একই উপসর্গ নিয়ে তারাও জ্বরে পড়লেন। হ্যানিম্যান এবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, কোনো রোগের প্রতিষেধক ভেষজকে সুস্থ দেহে প্রয়োগ করলে সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

১৮১১ খ্রি: পর্যন্ত তিনি তার নতুন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। অসংখ্য সুস্থ শরীরে জানা অজানা ভেষজ প্রয়োগ করেছেন আর তার ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভেষজের প্রতিক্রিয়া ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতেন হ্যানিম্যান। তার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার বিবরণ এক সময় প্রকাশ করলেন গ্রন্থাকারে। নাম দিলেন 'ল অব সিমিলারস'। এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য ছিলো, যে কোনো শক্তিশালী ওষুধ মানব শরীরে রোগের সৃষ্টি করে। ওষুধ যত শক্তিশালী হবে রোগের লক্ষণও শরীরে তত বেশি হবে। দ্বিতীয়ত : যে ওষুধ সুস্থ দেহে রোগ উৎপন্ন করে ঠিক সেই ওষুধটির দ্বারাই সেই